ATHENA, VOLUME V, JULY 2021 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 143-150
www.athenajournalcbm.in

পেশাগত রোগ, শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও আন্দোলন: একটি সাম্প্রতিক ইতিহাস—প্রসঙ্গ পশ্চিমবঙ্গ

নটরাজ মালাকার*

প্রাপ্ত: ০৬/০৬/২০২১ পরিমার্জন: ২৬/০৬/২০২১ গৃহীত: ০৪/০৭/২০২১

সারসংক্ষেপ: *কর্মক্ষেত্রে ঝুঁকিপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে কাজ করার ফলে বিভিন্ন পেশার মানুষ দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত হতে পারে। পেশাগত কার্যকলাপের ফলে সৃষ্ট এই রোগকে বলা হয় পেশাগত রোগ। বর্তমান প্রবন্ধে শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও পেশাগত রোগের ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। শ্রমিকের পেশাগত রোগের মধ্যে সিলিকোসিস হল একটি মারাত্মক রোগ। এই রোগ হয়ে থাকে কর্মক্ষেত্রের বাতাসের সিলিকা বা সিলিকন ডাই-অক্সাইড থেকে। কিন্তু শ্রমিকের এই রোগকে আমরা একটি অবহেলিত রোগ হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। কেননা আমাদের দেশে এই পেশাগত রোগগুলিকে ডাক্তারি পাঠ্যক্রমে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ফলে ডাক্তাররা রোগ নির্ণয়ের সময় পড়েন বিপদে। শিল্প মালিকেরাও শ্রমিকের স্বাস্থ্য নিয়ে মাথা ঘামায় না। কর্মক্ষেত্রের পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখার কজেও তাঁরা গাফিলতি দেখান। পেশাগত রোগে আক্রান্ত শ্রমিকের চিকিৎসা ও ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকার থাকলেও তাঁরা বারবার সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। তাছাড়া এদেশে এই রোগগুলির চিকিৎসার জন্য রয়েছে সরকারি উদ্যোগের অপ্রতুলতা। অথচ মূলস্রোতের ট্রেড ইউনিয়নগুলি শ্রমিকের স্বাস্থ্য অধিকারের দাবি নিয়ে কোনও বড় আন্দোলন সংগঠিত করেনি। তাই শ্রমিকেরা নিজেদের অধিকার নিজেরাই বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করেছে। তাঁরা তাঁদের লড়াইয়ে পাশে পেয়েছেন কিছু ব্যক্তি ও সংগঠনকে। বর্তমান প্রবন্ধে শ্রমিকদের এই স্বাস্থ্য আন্দোলনের ইতিহাস অনুসন্ধানের ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা করা হয়েছে।*

সূচক শব্দ: *কারখানা, শ্রমিক, দূষণ, স্বাস্থ্য, রোগ, সিলিকোসিস, চিকিৎসা, আন্দোলন।*

---

* পিএইচ.ডি. গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, নদীয়া।
e-mail: natarajandulberia@gmail.com

শিল্প থেকে সৃষ্ট দূষণ তুলনামূলকভাবে শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকের স্বাস্থ্যের ওপর বেশি প্রভাব ফেলে। যার ফলে শ্রমিকেরা বিভিন্ন পেশাগত রোগের দ্বারা আক্রান্ত হন। বর্তমান প্রবন্ধের বিষয় পশ্চিমবঙ্গে এই পেশাগত রোগ ও শ্রমিকের স্বাস্থ্য আন্দোলনের ইতিহাস। কিন্তু কাকে বলা হয় পেশাগত রোগ? বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, "occupational disease is any disease contracted primarily as a result of an exposure to risk factors arising from work activity."[১] পেশাগত রোগের মধ্যে সিলিকোসিস হল একটি মারাত্মক রোগ। এই রোগ হয়ে থাকে কর্মক্ষেত্রের বাতাসের সিলিকা বা সিলিকন ডাই-অক্সাইড থেকে। ভারতে এই রোগ প্রথম দৃষ্টিগোচরে আসে ১৯৪৭ সালে মহীশুরের কোলার সোনা খনিতে। এরপর থেকে এই ঘটনা পরিলক্ষিত হয় বিভিন্ন শিল্পে, যেমন- খনি শিল্প (কয়লা, সোনা, রূপা, সীসা, দস্তা, ম্যাংগানিজ এবং অন্যান্য ধাতু), মৃৎশিল্প এবং সিরামিক শিল্প, বিল্ডিং ও নির্মাণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে।[২]

এছাড়া অন্যান্য পেশাগত রোগগুলি হল কয়লা খনির শ্রমিকদের এনথ্রাকোসিস, টেক্সটাইল শিল্পের শ্রমিকদের বিসিনোসিস, চিনি শিল্পের শ্রমিকদের ব্যাগাসোসিস (১৯৫৫ সালে কলকাতায় প্রথম দেখা যায়), অ্যাসবেস্টস শিল্পের শ্রমিকদের অ্যাসবেস্টোসিস, লৌহশিল্পে সিডারোসিস, তামাক শিল্পে টোবাকোসিস, কৃষকদের ক্ষেত্রে দেখা যায় ফার্মার'স লাঙস।[৩] এই পেশাগত রোগগুলির মধ্যে সবগুলিই শ্বাস-প্রশ্বাস জনিত রোগ। তবে আমাদের দেশে এই পেশাগত রোগগুলিকে ডাক্তারি পাঠ্যক্রমে খুব বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় না। ফলে ডাক্তাররা রোগ নির্ণয়ের সময় পড়েন বিপদে। জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের সংগঠক চিকিৎসক পুণ্যব্রত গুণ বলেছেন "...আমাদের ডাক্তারি পাঠক্রমে পেশাগত রোগ কোনো গুরুত্বই পায় না – রোগগুলোকে চেনা বা রোগগুলোর চিকিৎসা করা কিছুই শেখানো হয় না আমাদের। আমাদের সময়কার প্রিভেন্টিভ ও সোস্যাল মেডিসিনের ৭১১ পাতার বইয়ে পেশাগত রোগগুলোর ভাগে জোটে ১৬টি পাতা।"[৪] তাছাড়া এদেশে এই রোগগুলির চিকিৎসার জন্য রয়েছে সরকারি উদ্যোগের অপ্রতুলতা। আসলে শ্রমজীবী মানুষের রোগ বলেই হয়তো এই অবহেলা করা হয়েছে। কিন্তু একটা কথা আমরা ভুলে যায় শ্রমিকরাও তো বৃহত্তর সমাজের অংশ। প্রশ্ন হচ্ছে তাহলে এই রোগ নিয়ে কি চিন্তা ভাবনা হয়নি?

ইতিহাস বলছে ১৯৩০-এর দশকের গোড়ার দিকে, আমেরিকায় গোলি ব্রিজ টানেল তৈরির সময় কয়েকশ শ্রমিক সিলিকোসিসে মারা গিয়েছিলেন এবং প্রকল্পে কাজ করার দুই বছরের মধ্যে আরও ১,৫০০ শ্রমিক এই রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। এই অবস্থায় বিপর্যয় মোকাবিলা করতে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার পদক্ষেপ নিয়েছিল। ১৯৩৮ সালে শ্রম সেক্রেটারি ফ্রান্সিস পারকিনস একটি জাতীয় সিলিকোসিস সম্মেলন করেন এবং "Stop Silicosis" নামে একটি প্রচারণা শুরু করেছিলেন। ১৯৯৬ সালে সিলিকোসিস সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে একটি নতুন প্রচারণা শুরু করেছিলেন। সিলিকোসিস নিয়ে শুরু করা হয়েছিল Special Emphasis Program (SEP)। এছাড়াও, OSHA, NIOSH, এবং American Lung Association একটি সম্মেলনেরও আয়োজন করেছিল।[৫]

ভারতে কয়েকটি শ্রমিক সংগঠন, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও কিছু ব্যক্তি মানুষ এই উপেক্ষিত বিষয়টি নিয়ে আন্দোলন শুরু করেছিলেন ১৯৮০-এর দশকে। গত কয়েক দশকে দেশ জুড়ে পেশাগত রোগ নিয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির চেষ্টা করা হয়েছে। এছাড়া শ্রমিকের রোগ নির্ণয় ও ক্ষতিপূরণ আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভারতে যেসব সংগঠন পেশাগত রোগ ও শ্রমিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিয়ে কাজ করেছে তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল আমেদাবাদের *Kamdar Swasthya Suraksha Mandal*, মুম্বাইয়ের *Occupational Health and Safety Centre*, দিল্লীর *Society For Participatory Research In Asia,* অমৃতসরের *National Textile Corporation*, গুজরাটের *Occupational Health and Safety Association*। পশ্চিমবঙ্গের রিষড়ার সৃজনী, বিশ্বপরিবার সপ্তাহে সোম ও শুক্রবার সন্ধ্যাতে একটি প্রাথমিক পেশাগত রোগ নির্ণয় কেন্দ্র চালাতো। বেলুড় শ্রমজীবী হাসপাতালেও পেশাগত রোগ নির্ণয়ের জন্য একটি ক্লিনিক খোলা হয়েছিল।[৬] পশ্চিমবঙ্গে পেশাগত স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিয়ে আন্দোলন করেছে আরেকটি সংগঠন যার নাম নাগরিক মঞ্চ (1989)।[৭] ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গের পেশাগত রোগে আক্রান্ত রোগীদের পাশে থেকেছে *Occupational Safety and Health Association of*

Jharkhand (2003) নামের সংগঠনটি।[৮] এবার দেখা যাক এরাজ্যের অবস্থাটা কেমন।

রাধারমণ পাইকার কলকাতার তারাতলা রোডে অবস্থিত পোদ্দার প্রজেক্ট সুতাকলে রিলিং বিভাগে কাজ করতেন। ওই কারখানার অন্যান্য শ্রমিকের মতো তাঁরও শ্বাসকষ্টের সমস্যা দেখা দিয়েছিল। ১৯৮৯ সাল থেকে তাঁর হাঁফানির চিকিৎসা শুরু হয় এবং ১৯৯২ সালের ডিসেম্বরে মানিকতলার ই.এস.আই হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল। ওই হাসপাতালের ডাক্তার রাধারমণের বিজিনোসিস হয়েছে বলে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলিন এবং তাঁর কাজের বিভাগ বদলের সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু কারখানার মালিক তাঁকে অন্য বিভাগে বদলি করতে রাজি ছিলেন না। তাই রাধারমণ ই.এস.আই-এর একজন বীমাকারি হিসেবে ই.এস.আই-এর কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করেন এবং তাঁর রোগ নির্ণয়ের জন্য বিশেষ মেডিকেল বোর্ড বসানোর আবেদন জানিয়েছিলেন। নাগরিক মঞ্চ এই বিষয়ে ই.এস.আই কর্তৃপক্ষের কাছে চিঠি দিয়েছিলেন। অবশেষে মেডিকেল বোর্ড ১৯৯৪ সালের মার্চ মাসে রাধারমণের বিজিনোসিস রোগ নির্ণয় করেছিলেন। তিনি কিছু ক্ষতিপূরণ পেলেও কারখানার মালিক তাঁর কাজের বিভাগ বদল করেননি। ফলে রাধারমণকে তাঁর লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছিল। অন্য দিকে নাগরিক মঞ্চ শ্রমমন্ত্রীকে এক চিঠিতে ওই কারখানার বাকি সব শ্রমিকের স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও কারখানার দূষণ কমানোর ব্যবস্থা নিতে অনুরোধ জানিয়েছিলেন।[৯]

১৯৮৮ সালে ঝাড়গ্রামের আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম চেঁচুড়গেড়িয়ায় গড়ে উঠেছিল ‘সুরেন্দ্র খনিজ প্রাইভেট লিমিটেড’ নামে কোয়ার্জ পাথর ভাঙার একটি কারখানা, যেখানে দূষণ নিয়ন্ত্রণের কোনও ব্যবস্থা ছিল না। পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের ছাড়পত্র ছাড়াই জনবসতির মাঝে কারখানাটি গড়ে উঠেছিল। ওই কারখানা থেকে উৎপাদিত পাথরের গুঁড়ো চেঁচুড়গেড়িয়া সহ বরিয়া, কাজলা, পশরো, লেদাবহেড়া, কলাবনি, বাঁদরভোলা গ্রামের বায়ুকে দূষিত করেছিল। শ্রমিক ও গ্রামের মানুষেরা সিলিকোসিস রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন, যাদের মধ্যে অনেকের মৃত্যু হয়েছিল। গ্রামবাসীরা কাজ বয়কট করলে কারখানার মালিক মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বিহার থেকে শ্রমিক এনে কারখান চালু রেখেছিল। আদিবাসী মানুষগুলো তাঁদের দুরাবস্থার কথা জানিয়েছিল কোয়ার্ক সায়েন্স সেন্টার ও কোয়ার্ক পত্রিকার সম্পাদক বিজন ষড়ঙ্গীকে। এরপর বিভিন্ন সংগঠনের সদস্যদের উদ্যোগে ওই গ্রামেগুলোতে সমীক্ষা চালানো হয়েছিল। গ্রামের মানুষদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করে জানা গিয়েছিল যে তাঁরা সিলিকোসিস রোগে আক্রান্ত। বিজন ষড়ঙ্গী ও তাঁর সংগঠনের কর্মীরা কারখানা বন্ধের জন্য মিটিং, মিছিল, স্ট্রিট কর্ণার, লিফলেট বিতরণ, গণস্বাক্ষর সংগ্রহ ইতাদির মাধ্যমে আন্দোলন চালিয়েছিলেন। কোয়ার্ক সায়েন্স সেন্টারের ব্যাপক আন্দোলনের ফলে ১৪.০৪.১৯৯৩ তারখে কারখানাটি বন্ধ হয়ে যায়।[১০] তিনি পত্রিকা প্রকাশ ও আন্দোলনের মাধ্যমে দূষণের হাত থেকে শ্রমিক ও গরিব মানুষকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন।

তবে কারখানা বন্ধ হলেও মৃত্যুর মিছিল থামেনি। কারখানার মালিক কম বেতন দিয়ে শ্রমিকদের কাজ করিয়ে নিতেন এবং অসুস্থ শ্রমিকদের চিকিৎসার ব্যবস্থাও করতেন না। অসুস্থরা চিকিৎসা পাওয়ার জন্য তাঁদের শেষ সম্পদটুকু বিক্রি করতে বাধ্য হতেন। কোনও শ্রমিক সংগঠন বা সরকার ওই গরিব মানুষগুলোর কথা ভাবেনি। দ্বারকানাথ স্মৃতিরক্ষা কমিটি ও কোয়ার্ক সায়েন্স সেন্টারের কর্মীরা অসুস্থ ও মৃতের পরিবারগুলোকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিল। ক্ষতিপূরণের দাবিতে তাঁরা গ্রামবাসীদের সঙ্গে নিয়ে এসডিও-এর কাছে ডেপুটেশন দিয়েছিল।[১১]

চেঁচুড়গেড়িয়ার ওই মর্মান্তিক ঘটনা ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল Wait Until Death নামে Documentary Film-এ। ১৯৯৫ সালের ৫ জুন ওই তথ্যচিত্রটি কলকাতার নন্দন প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হয়েছিল। প্রেক্ষাগৃহে উপস্থিত ছিলেন দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের ল অফিসার। ঝাড়গ্রাম থেকে বিজন ষড়ঙ্গীর সঙ্গে এসেছিলেন সিলিকোসিসে আক্রান্ত কয়েকজন শ্রমিক ও মৃতদের পরিবার কয়েকজন।[১২] ইতিমধ্যে ‘সংবাদ প্রতিদিন’ খবরের কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল যে পুরুলিয়ায় দু’হাজার ক্র্যাশার শ্রমিক সিলিকোসিসে ভুগছে। যে তথ্য পাওয়া গিয়েছিল ‘Advance Social Action With Rural and Tribal Inhabitant of India’ নামে একটি বেসরকারি সংগঠনের পুরুলিয়ার বেশ কিছু পাথর খাদানের শ্রমিকদের উপর করা সমীক্ষা থেকে। ওই সমীক্ষক দলে ছিলেন তিনিজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, অ্যানা ফ্রেঞ্চ নামে ফ্রান্সের একজন পরিবেশ

বিশেষজ্ঞ, বিজন ষড়ঙ্গী প্রমুখ।[১৩] চেঁচুড়গেড়িয়ার গড়ে ওঠা 'রশ্মি সিমেন্ট' কারখানা থেকে নিঃসৃত জিমসাম গুঁড়োও গ্রামবাসীদের স্বাস্থ্যের উপর খারাপ প্রভাব ফেলেছিল। ওই কারখানাটিতেও দুষণ নিয়ন্ত্রণের উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না।[১৪] 'রশ্মি সিমেন্ট' কারখানায় কর্মরত কিছু শ্রমিক কোয়ার্ক সায়েন্স সেন্টারের দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছিল। যে অভিগযোগগুলি সংগঠনের মুখপত্র টপ কোয়ার্কে ছাপানো হয়েছিল। এছাড়া জানা গিয়েছিল যে বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভূম, মেদিনীপুর ও পুরলিয়া জেলায় মোট ১৫০টির মতো পাথর ভাঙার ইউনিট ছিল, যাদের কাছে দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদের এ.আই.আর (পিসিবি) অ্যাক্ট ১৯৮১ অনুযায়ী ইউনিট চালাবার ছাড়পত্র ছিল না।[১৫]

সিলিকোসিসে আক্রান্ত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ পাওয়ার লড়াইয়ে তাঁদের পাশে দাঁড়িয়েছিল নাগরিক মঞ্চ। এই সংগঠন 'সুরেন্দ্র খনিজ প্রাইভেট লিমিটেড'-এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা করেছিল। কিন্তু মালিক পক্ষ ওই ঘটনার কথা অস্বীকার করেছিল। সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য শ্রম কমিশনারকে তদন্ত কমিশন গঠন করে রিপোর্ট জমা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। ওই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে ২৬.০৯.১৯৯৬ তারিখে সুপ্রিম কোর্ট কারখানার মালিকদের আদেশ দিয়েছিল যে ১৬ জন মৃত শ্রমিকের পরিবারকে এবং ১২ জন জীবিত অসুস্থ শ্রমিককে এক লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। কিন্তু কারখানার মালিক সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অমান্য করেছিল। রাজ্য সরকারও এ বিষয়ে কোনও উদ্যোগ দেখায়নি। ০৯.০২.২০০১ তারিখে সুপ্রিম কোর্ট মেদিনীপুরের জেলাশাসককে নির্দেশ দিয়েছিল যে ৩১ মার্চের মধ্যে মালিকপক্ষ ক্ষতিপূরণের টাকা জমা না দিলে তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি ক্রোক করে টাকা আদায় করা হবে। সুপ্রিম কোর্টের ওই রায় ভারতের ইতিহাসে এক দৃষ্টান্ত তৈরি করেছিল। অবশেষে মালিকপক্ষ ক্ষতিপূরণের টাকা দিতে বাধ্য হয়েছিল।[১৬] শ্রমিকদের দীর্ঘ দিনের আন্দোলন সফল হয়েছিল। আর এই সাফল্যের পিছনে প্রধান অবদান ছিল কোয়ার্ক সায়েন্স সেন্টার ও নাগরিক মঞ্চের। বিজন ষড়ঙ্গীর লড়াই এখানেই থামল না। তিনি বাঁকুড়া, মেদিনীপুর ও অন্যান্য জায়গায় স্পঞ্জ আয়রণ কারখানা থেকে সৃষ্ট দূষণ রোধ করতে চেয়েছিলেন। শুধু পত্রিকায় লেখালিখি নয়, ব্যাপক প্রচার সহ প্রত্যক্ষ আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন বিজন ষড়ঙ্গী।[১৭]

১৯৮০-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে কলকাতার রিজিওনাল অকুপেশনাল হেলথ সেন্টার হাওড়ার জে.ডি. জোনস কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে কয়েকজনকে অ্যাসবেস্টোসিসের রোগী হিসেবে চিহ্নিত করেছিল। এছাড়া বেলুড় ই.এস. আই হাসপাতাল জে.ডি. জোনসের কারখানার শ্রমিক গঙ্গাশরন লোধের অ্যাসবিটোসিস রোগ নির্ণয় করে। ফলে তাঁকে অক্ষমতাজনিত সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এর এক বছর পরে গঙ্গাশরণ মারা গিয়েছিল। ইতিমধ্যে এই বিষয়টি নিয়ে একটি বেসরকারি সংস্থা সুপ্রিমকোর্টে মামলা করেছিল। সুপ্রিম কোর্ট রাজ্য সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল বিষয়টি তদন্ত করার জন্য। ফ্যাক্টরি ইনস্পেকটর (মেডিকেল) জে.ডি জোনস কারখানার ২৪জন শ্রমিক অ্যাসবেস্টোসিস রোগে আক্রান্ত বলে ঘোষণা করেন। ওই শ্রমিকদের কাজের জায়গা পরিববর্তন করে অ্যাসবেসটস গুঁড়ো নেই এমন জায়গায় কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল। এঁদের মধ্যে দু'জন মারা গিয়েছিল ও কয়েকজন অবসর নিয়েছিল।[১৮] কিন্তু সকলে ক্ষতিপূরণ পেয়েছিল কি না জানা যায় না। ১৯৯৫ সালে AITUC-এর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্মেলনে দূষণ ও শ্রোমিকের পেশাগত রোগের প্রসঙ্গ উঠে এসেছিল। ওই সম্মেলনে দাবি করা হয়েছিল যে "দূষণের হাত থেকে শ্রমিকদের বাঁচাবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে এবং পেশাগত রোগ নির্ণয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।"[১৯] ১৯৯৭ সালের ৫ ও ৬ এপ্রিল বেলুড়ে পেশাগত রোগ নিয়ে দু'দিনব্যাপী একটি ওয়ার্কশপের আয়োজন করেছিল শ্রমজীবী হাসপাতাল, নাগরিক মঞ্চ ও ব্যাংক অব বরোদা এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন। পেশাগত রোগে আক্রান্ত শ্রমিকেরা উপস্থিত হয়েছিলেন ওই ওয়ার্কশপে। এছাড়াও বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন ও বেলুড় ই.এস.আই হাসপাতালের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেছিলেন।[২০] কিন্তু অবস্থার কোনও পরিবর্তন হয়নি। কারখানার মালিক এবং কেন্দ্র বা রাজ্য সরকার শ্রমিকের পেশাগত রোগকে বারবার অবহেলা করেছে।

চেঙ্গাইলের মৈত্রি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসার জন্য আসা শতাধিক জুটমিল শ্রমিকদের নিয়ে ২০০২-০৩ সাল নাগাদ ডাঃ পুণ্যব্রত গুণ সহ ওই স্বাস্থ্যকেন্দ্রের চিকিৎসকরা একটা পাইলট সার্ভে করেছিলেন। ওই সার্ভের প্রশ্নমালা তৈরি করে

দিয়েছিলেন অল ইন্ডিয়া ইন্সটিটিউট অফ হাইজিন অ্যান্ড পাবলিক হেলথ-এর কমিউনিটি মেডিসিনের বিভাগীয় প্রধান ডাঃ রণদেব বিশ্বাস। প্রশ্নের উত্তর নথিভুক্ত করার পাশাপাশি শ্রমিকদের ওজন, উচ্চতা এবং পিক ফ্লো-মেট্রি (ফুসফুসের কর্মক্ষমতা মাপার একটি পরীক্ষা) পরীক্ষা করা হয়েছিল। সার্ভের ফলাফল থেকে জানা গিয়েছিল কটনমিলের শ্রমিকদের বিসিনোসিসের মতো জুটমিলের শ্রমিকদেরও এক ধরনের পেশাগত রোগ হয়। তবে অন্য পেশাগত শ্বাসরোগগুলির আইনি স্বীকৃতি থাকলেও জুট শ্রমিকদের শ্বাসরোগের আইনি স্বীকৃতি ছিল না।[২১] কিন্তু দুঃখের বিষয় জুটমিলের শ্রমিকদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার দাবিতে শ্রমিক ইউনিয়নগুলি কোনও আন্দোলন গড়ে তোলেনি।

কৃষি থেকে পর্যাপ্ত আয় না হওয়ায় ২০০৩-২০০৪ সাল নাগাদ উত্তর চব্বিশ পরগণা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার বিভিন্ন গ্রামে দারিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারি কিছু কৃষক বারাসাতের একটি কোয়ার্টজ পাথর ভাঙার কারখানায় কাজে গিয়েছিলেন। বেশি অর্থ উপার্জনের জন্য তাঁরা আসানসোল, রানীগঞ্জ ও কুলতির রেমিং মাস উৎপাদন কারখানায় কাজ করতে গিয়েছিলেন। ২০০৮ সালে আয়লার ঝড়ে সুন্দরবন অঞ্চলে অনেক গ্রামের চাষের জমি কৃষিকাজের অযোগ্য হয়ে যায়। রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে কৃষিকাজ ছেড়ে মিনাখাঁ ব্লকের কিশোর, যুবকরা কাজের সন্ধানে বর্ধমানের পাথর ভাঙা কারখানায় কাজে নিযুক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের চাকরি স্থায়ী হয়নি। কিছু দিন কাজ করার পর তাঁরা অসুস্থ হতে থাকেন। যার ফলে মালিক তাদেরকে কাজ থেকে ছাড়িয়ে দিয়েছিলেন। শ্রমিকরা সিলিকোসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে ২০১০-২০১১ সাল নাগাদ নিজের গ্রামে ফিরে আসতে শুরু করেছিলেন।[২২]

শমিত কুমার কর, Occupational Safety and Health Association of Jharkhand-এর সম্পাদক, পশ্চিমবঙ্গে সিলিকোসিসে আক্রান্ত হয়ে ১৩ জনের মৃত্যুর বিষয়টির প্রতি মানবধিকার কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ক্ষতিপূরণ আদায়ের দাবিতে মানবাধিকার কমিশনে একটি আবেদন করেছিলেন। সফিউদ্দিন মোল্লা, নাসির মোল্লা, আবুল পাইক, মুজাফফর মোল্লা এবং বাবুসোনার মৃত্যুর সার্টিফিকেটও কমিশনে জমা দিয়েছিলেন তিনি।[২৩] নব দত্ত, নাগরিক মঞ্চের সম্পাদক, ২৮.০৭.২০১৫ তারিখে কমিশনে আরেকটি অভিযোগ পত্র জমা করেছিলেন। নবদত্ত জানিয়েছিলেন ২০১০ থেকে ২০১৩ সালে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার সুন্দরবন এলাকে থেকে বর্ধমানের বিভিন্ন খনি ও পাথর ভাঙার কারখানাতে কাজে গিয়েছিলেন বেশ কিছু শ্রমিক। তাঁদের মধ্যে ২০০ জন ছিলেন মিনাখাঁ থেকে। তাঁরা কাজ করতেন মেসার্স লক্ষ্মী স্টোন ফ্যাক্টরি, তারা মা মিনারেল ফ্যাক্টরি, মেসার্স বালকৃষ্ণ ফ্যাক্টরিতে। নব দত্ত জানিয়েছিলেন ১৮৯ জন শ্রমিক সিলিকোসিস রোগে আক্রান্ত হয়েছেন এবং ১৩ জন মারা গিয়েছেন। তাই অসুস্থদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ও নিহতদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দাবি জানিয়েছিলেন তিনি।[২৪]

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শ্রমদপ্তরের যুগ্ম সচিব কমিশনকে জানিয়েছিলেন যে ১৩ জনের মধ্যে ৮ জন সিলিকোসিসে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন। নিহত ১৩ জন উপরিউক্ত কারখানাগুলিতে কাজ করলেও এমপ্লয়মেন্ট রেজিস্টারে তাঁদের নাম ছিল না। কমিশন মনে করেছিল পশ্চিমবঙ্গের এনফোর্সমেন্ট এজেন্সিগুলি যদি সতর্ক থাকতো এবং কারখানা পরিচালন কর্তৃপক্ষের দ্বারা শ্রমিকদের স্বাস্থ্য রক্ষার বিষয়টি যদি সুনিশ্চিত করতো তাহলে যারা সিলিকোসিসে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছিলেন তাঁদের জীবন বাঁচানো যেতো। কমিশনের মতে পশ্চিমবঙ্গ সিলিকোসিসে আক্রান্ত রোগীদের জীবন রক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাই নিহতদের নিকট আত্মীয় ক্ষতিপূরণ পাওয়ার অধিকারী।[২৫] ২০১৭ সালে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন উত্তর চব্বিশ পরগণার মিনাখাঁয় সিলিকোসিসে মৃত ৫ জন শ্রমিকের পরিবারকে চার লক্ষা টাকা করে দেওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে নির্দেশ দিয়েছিল।[২৬]

শান্তি গণতন্ত্র সংগহতি মঞ্চের পক্ষ থেকে মিনাখাঁর গোয়ালদহ গ্রামের সিলিকোসিসে আক্রান্ত শ্রমিকদের খাদ্য সামগ্রি দিয়ে সাহায্য করা হয়েছিল। ওই সংগঠনের সদস্যরা অসুস্থদের চিকিৎসার জন্য গোয়ালদহ গ্রামে মেডিকেল ক্যাম্প খুলেছিল। পরবর্তীতে ওখানে দুই বেডের একটি স্বাস্থ্য সেবা কেন্দ্র খুলেছিল। উত্তর চব্বিশ পরগণা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার বিভিন্ন গ্রামে সিলকোসিসে আক্রান্তের মোট সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ৭০০ জন। মৃত্যু হয়েছিল ৪১ জনের। শান্তি গণতন্ত্র

সংগহতি মঞ্চের সহযোগিতায় ক্ষতিপূরণের পাওয়ার দাবিতে শ্রমিকরা হাই কোর্টে মামলা করেছিল। প্রায় ২৫টি গ্রামের শ্রমিকরা তাঁদের দাবি আদায় করার জন্য ২০১৮ সালে গড়ে তুলেছিল "সিলিকোসিস আক্রান্ত সংগ্রামী শ্রমিক কমিটি (SASSC)"। উত্তর চব্বিশ পরগণা ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার প্রায় ২৫টি গ্রামের শ্রমিকদের নিয়ে গড়ে উঠেছিল এই কমিটি। ২০১৮ সালের ২৫ অক্টোবর SASSC-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে প্রায় আড়াই হাজার শ্রমিক, কৃষক নিজেদের অধিকারের দাবিতে উত্তর চব্বিশ পরগনার মালঞ্চ থেকে মিনাখাঁ পর্যন্ত এক মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন।[২৭]

ইতিমধ্যে ২০১৮ সালের ৩ অক্টোবর কলকাতা হাইকোর্ট রাজ্য সরকারে নির্দেশ দিয়েছিল, হরিয়ানা মডেলে সিলিকোসিসে মৃতের পরিবারগুলিকে এককালীন ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। আক্রান্ত ও মৃতের পরিবারগুলিকে পেনশনের ব্যবস্থা এবং তাদের সন্তানদের পড়াশোনার ব্যবস্থা করতে হবে। মেয়েদের বিয়ের ব্যবস্থা সরকারকেই করতে হবে। সেই সঙ্গে চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে।[২৮]

২০১৮ সালের নভেম্বর মাসের ২৮ তারিখে নাগরিক মঞ্চের পক্ষ থেক নব দত্ত ও প্রসেনজিৎ মুখার্জীর আহ্বানে কলকাতায় All West Bengal Sales Representatives' Union (AWBSRU)-এর guest house-এ এক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃত্ব, মানবাধিকার কর্মী, শ্রমিক, অধ্যাপক, গবেষক প্রমুখ। এই সভায় প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল শ্রমিকের পেশাগত রোগ। বিশেষত জোর দেওয়া হয়েছিল অ্যাসবেস্টোসিস রোগ প্রতিরোধের ওপর।[২৯]

২০১৯ সালের ১৫ জুলাই বিকেলে কলকাতার সূর্য সেন স্ট্রিটের কৃষ্ণপদ ঘোষ মেমোরিয়াল হলে আয়োজন করা হয়েছিল এক গণকনভেনশনের। কনভেনশনের নাম দেওয়া হয়েছিল 'সিলিকোসিস: এক মহামারী, উৎস ও প্রতিকার'। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সিলিকোসিস আক্রান্ত সংগ্রামী শ্রমিক কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চ, শ্রমজীবী স্বাস্থ্য উদ্যোগ, NTUI, AWBSRU, AITUC, AICCTU, CITY, TUCC, UTUC, IFTU, HSA, AHSD-এর মতো ২৫টি সংগঠনের প্রতিনিধিরা। পাশাপাশি, যাঁদের জন্য আন্দোলন সেই সিলিকোসিস আক্রান্ত শ্রমিকেরাও তাঁদের পরিবার নিয়ে উপস্থিত ছিলেন। কোনও সংগঠনের প্রতিনিধি হিসেবে নয়, ব্যক্তিগত উদ্যোগে হাজির ছিলেন কিছু চিকিৎসক, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও গবেষকরা। পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের তরফে বক্তব্য রাখেন সৌরভ চক্রবর্তী। তিনি আক্ষেপ করে বলেন, "সিলিকোসিসে আক্রান্ত রোগী, তাদের মৃত্যু এবং অল্প বয়সে মেয়েদের বিধবা হওয়া, এই বিষয়ে কবিতা, উপন্যাস, গল্প লেখা উচিত ছিল। কিন্তু কেউ সেই কাজটা করেননি।"[৩০]

স্বাস্থ্য আন্দোলনের লড়াকু কর্মী ডাঃ পুণ্যব্রত গুণের মতে সিলিকোসিস মহামারীর আকার ধারণ করতে চলেছে। আজ যখন বামপন্থীরা সরকার বদল করে সমস্যা সমাধানের কথা বলছেন, তখন তিনি বাম জমানায় রাজ্যে পেশাগত রোগের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেন, "সরকার বদলে করে কোনও কাজ হবে না, বদলাতে হবে মানসিকতা"। তাছাড়া রোগ নির্ণয়ের জন্য সবসময়ে সরকারের দিকে না তাকিয়ে থেকে ডাক্তারদের কমিটি তৈরি করেও যে পেশাগত রোগে আক্রান্ত রোগীকে চিহ্নিত করা যেতে পারে সে বিষয়েও পরামর্শ দেন তিনি।[৩১]

সিলিকোসিসে আক্রান্ত শ্রমিকদের অভিজ্ঞতা থেকে জানা গিয়েছে যে অধিকাংশ শ্রমিক যখন সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য গিয়েছেন তখন তাঁদের প্রেসক্রিপশনে সঠিক রোগের নাম লেখা হয়নি। প্রেসক্রিপশনে লেখা হতো যে শ্রমিকরা যক্ষ্মায় আক্রান্ত। শ্রমিকদের বক্তব্য ছিল যে তাঁরা যেহেতু সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করেছিল এবং আন্দোলন করেছিল তাই চিকিৎসকরা প্রেসক্রিপশনে সিলিকোসিস রোগের নাম লিখতো না।[৩২] নব দত্তের মতে "রাজ্যের পাথর খাদানগুলিতে দীর্ঘ দিন ধরে এই রোগের প্রকোপে ভুগছেন শ্রমিকরা। কিন্তু অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের সিলিকোসিস নির্ণয় করা, বা সরকারকে জানানোর নিয়ম মানা হয় না।" ই.এস.আই হাসপাতালের চিকিৎসক কুণাল দত্ত বলেছেন "শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া, পূর্ণ বেতন এবং বিনা খরচে চিকিৎসার দায় এড়াতেই সিলিকোসিসকে যক্ষ্মা বলে চালান অনেকে।"[৩৩]

শ্রমিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষা এবং পেশাগত রোগে আক্রান্ত রোগীর ক্ষতিপূরণ পাওয়া নিশ্চিত করতে এদেশে একাধিক আইন আছে। শ্রমিকের পেশাগত রোগের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে *Factories Act 1948, Mines Act 1952, Workmen's Companion Act, 1923* তে। এই সব আইনে পেশাগত রোগ প্রতিরোধ এবং প্রতিকারেরে নানা উপায়ের কথা বলা হয়েছে। তাছাড়া পেশাগত রোগ প্রতিকারের জন্য চালু করা হয়েছে 'এমপ্লয়িস স্টেট ইনস্যুরেন্স অ্যাক্ট, ১৯৪৮' (ই এস আই)।[৩৪] উল্লেখযোগ্য যে এই আইনগুলতে সংগঠিত শিল্পের শ্রমিকদের সুরক্ষার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সিলিকা উৎপাদনকারী কারখানাগুলির মালিকেরা সুচতুর ভাবেই শ্রমিকদের সংগঠিত হতে দেন না। আমরা দেখেছি তারা মা মিনারেলস ও লক্ষ্মী স্টোন ফ্যাক্টরির নাম ডায়রেক্টরেট অফ ফ্যাক্টরিসে নথিভুক্ত ছিল না। বালাকৃষ্ণন মিনারেলসের নাম ডায়রেক্টরেট অফ ফ্যাক্টরিসে এবং ইএসআইতে নথিভুক্ত থাকলেও মিনাখাঁ থেকে ওই কারখানায় কাজ করতে যাওয়া শ্রমিকদের নাম ইএসআইতে নথিভুক্ত ছিল না।[৩৫] এর ফলেই শ্রমিকেরা তাঁদের অধিকার থেকে বারবার বঞ্চিত হয়েছেন।

সূত্র নির্দেশ:

১. World Health Organization, https://www.who.int/occupational_health/activities/occupational_work_diseases/en/#:~:text=An%20%E2%80%9Coccupational%20disease%E2%80%9D%20is%20any,the%20development%20of%20such%20diseases, retrieved on 29.03.2021.
২. Park, K, (2015). *Park's Text Book of Preventive and Social Medicine*, Jabalpur: Banarsidas Bhanot, 23rd edition. pp. 833-34.
৩. *Ibid.*, pp. 833-34.
৪. গুণ, পুণ্যব্রত, (২০১৮), *পা মিলিয়ে পথচলা,* কলকাতা: কথাশিল্প, পৃ. ১১৫।
৫. "Status of Regulatory Efforts", https://www.silica-safe.org/regulations-and-requirements/status-of-regulatory-efforts/history, retrieved on 30.03.2021.
৬. নাগরিক মঞ্চ, (১৯৯৯), *জীবন ও জীবিকার জন্যে*, কলকাতা: নাগরিক মঞ্চ, পৃ. ৫৯-৬১।
৭. নাগরিক মঞ্চ, https://nagarikmancha.org/.
৮. OSHAJ (Occupational Safety and Health Association of Jharkhand), https://oshaj.org/about-us/.
৯. নাগরিক মঞ্চ, (১৯৯৫), *বিপন্ন পরিবেশ* ২, কলকাতা: নাগরিক মঞ্চ, পৃ. ৫৮-৫৯।
১০. ষড়ঙ্গী, বিজন, (১৯৯৫), সবুজ অরণ্যে মৃত্যুমিছিল, *টপ কোয়ার্ক*, ১ম বর্ষ, সংখ্যা ৫, পৃ. ১৭-৩৫।
১১. *তদেব*।
১২. (২০০০), সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, *টপ কোয়ার্ক*, ৯ম বর্ষ, ফেব্রুয়ারি-মার্চ সংখ্যা, পৃ. ৩।
১৩. সংবাদ প্রতিদিন, ১৩.১২.১৯৯৬।
১৪. News in The Telegraph, 26.03.1996 (reprinted in *Top Quark*, Vol. 2, Issue. 4 & 5, August-November, 1996, p. 58).
১৫. নাগরিক মঞ্চ, (১৯৯৫), *বিপন্ন পরিবেশ* ২, *পূর্বোক্ত*, পৃ. ৫৯।
১৬. কোয়ার্ক সায়েন্স সেন্টার ও নাগরিক মঞ্চ কর্তৃক প্রকাশিত লিফলেট, তারিখ অনুল্লিখিত।
১৭. চট্টোপাধ্যায়, সব্যসাচী, (২০১১), স্মরণে বিজন ষড়ঙ্গী, *স্বাস্থ্যের বৃত্তে*, ডিসেম্বর সংখ্যা, পৃ. ২৮-২৯।
১৮. দাস, জয়ন্ত কুমার, (২০০১-২০০২), পেশাগত স্বাস্থ্য ও পেশাগত রোগ, *টপ কোয়ার্ক*, ডিসেম্বর-মার্চ সংখ্যা, পৃ. ৯-২১।
১৯. মিত্র, শিশির, (১৯৯৫), পরিবেশ রক্ষায় শ্রমিকদের ভূমিকা, *স্বাস্থ্য ও পরিবেশ*, ৭ম বর্ষ, সংখ্যা ৫, পৃ. ১৯৫-১৯৬।
২০. Mukul, (1997), Environment and Workers' Health: A case for Intervention, *Economic and*

Political Weekly, Vol. 32, No. 35, pp. L37-L44.

২১. গুণ, পুণ্যব্রত, (২০১৮), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১১৫-১১৯।

২২. কর, শমিত কুমার, (২০২১), সিলিকোসিস রোগে মৃত্যুর ঢল—'শ্রমিকশ্রেণির দুর্গ' থেকে মিনাখাঁ, https://www.4numberplatform.com/?p=24071, ডাউনলোডের তারিখ: ২০.০৩.২০২১।

২৩. *তদেব।*

২৪. A letter from Naba Dutta, General Secretary of Nagarik Mancha, Kolkata to Chairman of Human Rights Commision, New Delhi dated 28.07.2015.

২৫. A letter from Assistant Registrar (Law) of Human Rights Commission to Naba Dutta, General Secretary of Nagarik Mancha, dated 20.06.2016 (Case No.1358/25/4/2015).

২৬. Basu, Jayanta "Damages for silicosis victim kin", The Telegraph, 22.05.2017, https://www.telegraphindia.com/west-bengal/damages-for-silicosis-victim-kin/cid/1401970, retrieved on 28.03.2021.

২৭. বর্ণব, মালঞ্চ থেকে মিনাখাঁ—সিলিকোসিসে আক্রান্ত সহস্রাধিক শ্রমিক, প্রতিবাদে পথে নেমেছে মানুষ, https://www.groundxero.in/2018/10/29/silicosis-protest-rally/, ডাউনলোডের তারিখ: ২৮.০৩.২০২১।

২৮. হুদা, সামসুল, একের পর এক মৃত্যু, তবু ক্ষতিপূরণ পেলনা অনেকে, *আনন্দবাজার পত্রিকা,* https://www.anandabazar.com/west-bengal/24-parganas/many-died-in-silicosis-but-few-only-got-compensation-1.1104710, ডাউনলোডের তারিখ: ২১.০৩.২০২১।

২৯. ২৮.১১.২০১৮ তারিখে নাগরি মঞ্চ আয়োজিত আলোচনা সভা।

৩০. মালাকার, নটরাজ, (২০১৯), মহামারির মুখোমুখি সিলিকোসিস, 'জাতের নয় ভাতের লড়াই', https://www.eimuhurte.com/national/silicosis-convention-9293/, ডাউনলোডের তারিখ: ২১.০৩.২০২১।

৩১. *তদেব।*

৩২. চক্রবর্তী, সুদর্শনা, সিলিকোসিসের বিরুদ্ধে দানা বাঁধছে আন্দোলন, https://www.groundxero.in/2019/08/03/convention-on-silicosis/, ডাউনলোডের তারিখ: ২৫.০৩.২০২১।

৩৩. বসু, নির্মল, (২০১৩), পরপর মৃত্যু খাদান শ্রমিকদের, সন্দেহ সিলিকোসিস, *আনন্দবাজার পত্রিকা,* http://archives.anandabazar.com/archive/1131119/19swasth1.html, ডাউনলোডের তারিখ: ২১.০৩.২০২১।

৩৪. নাগরিক মঞ্চ, ২০০৩), *প্রসঙ্গ শ্রমিক*, কলকাতা: নাগরিক মঞ্চ, পৃ - ১১৯-১৩৭, ১৪৭-১৫২।

৩৫. কর, শমিত কুমার, (২০২১), *পূর্বোক্ত*।